Website: https://www.parthasarathipatrika.com

২৭ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই আষাঢ়, ১৪২৯ / 24.06.2022

–: সম্পাদক :–

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
যোগবাণী	পরমহংস যোগানন্দ
অশোকবিজয় রাহা - যেমন দেখেছি	শ্রী দিব্যজ্যোতি রাহা
তিনটি চিঠি	শ্রী সুনন্দন ঘোষ
খিদে	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

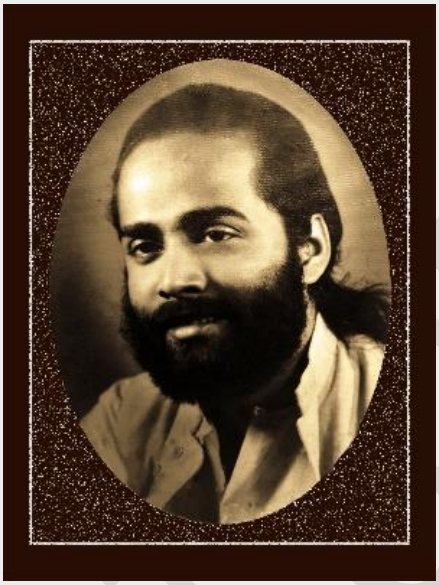

(10.03.1926 - 24.11.1986)

প্রীতি-কণা

"এই বিশ্বটাই ভগবানের কর্মলীলা। এই দিব্যকর্ম করতে হবে আত্মসংযম এর দ্বারা। আত্মসংযম মানে নিগ্রহ নয়। জোর করে ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করলেই আত্মসংযম হয় না। মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে লাগিয়ে রেখে ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম করাই আসক্তি এবং আসক্তি বর্জন করে কর্ম করাই কর্মযোগের মূল কথা।"

DO NOT COPY

(15.10.1936 - 24.10.2019)

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

খুব ইচ্ছে ছিল পার্থসারথির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ফিরে আসি, কিন্তু হয়ে উঠছে না। এই বিশাল জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে হালে পানি পাই না। তবু আজকাল অনেক গুছিয়ে উঠেছি। আবার আগের মত Spirited হবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। দুঃখ দুঃখ করে কোন লাভ নেই। নিজের দুঃখের বোঝা নিজেকে বইতে হয়। অন্যে শুধু করুণ সুর করে জিজ্ঞেস করতে পারে, "ওদিকের কি খবর?" আজকাল আর এ প্রশ্নটা আমাকে বিচলিত করে না, আমি জানি এ প্রশ্নের উত্তর দেবে বাপী।

শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিনে দাদু-ঠাকুরমার সঙ্গে এসেছিল শ্রীমন্তী। ওকে রাগাতে আমার খুব ভাল লাগে। আমার কোনও কথার পরেই দেখলাম সে জুতো পরে দরজার ছিটকিনী খুলতে যাচ্ছে। কিন্তু চার বছরের মেয়ে হাত পাবে কেন? গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওকে দেখে আমার অল্প বয়সের কথা মনে পড়ে গেল। রাগলে আমি আর বাড়িতে থাকতে পারতাম না। যেদিকে দু'চোখ যায় হাঁটা দিতাম। রাগ কমলে আবার ফিরে আসবার পথ পেতাম না। বাবাকে এই নিয়ে বেশ হ্যাপা পোহাতে হয়েছে।

বিয়ের পরও রাগ হলে বাড়িতে থাকতাম না। শ্রীপ্রীতিকুমার বারণ করতেন না, কিছু বলতেন না, নিজের অন্যায় হলে ক্ষমা চেয়ে নিতেন। একবার গীতাদিকে সম্ভবতঃ বলেছিলেন, "কোথায় আর যাবে? দেখবে ঠিক সেই রাত ৯টার মধ্যে ফিরে আসবে।" প্রকৃতপক্ষে তাই হত।

DO NOT COPY

একবার প্রচণ্ড ক্ষোভে আমি বাইরে চাকরীর আবেদন করেছিলাম। সে সময়ে শ্রীপ্রীতিকুমারের হাজারিবাগ কোলিয়ারীতে যাতায়াত শুরু হয়েছিল। তখন বিভিন্ন Business Magnet-রা সপরিবারে বা সস্ত্রীক আমাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করতেন। চাকরী, সংসার, ছোট ছেলে নিয়ে আমি হিমসিম খেতাম। তাছাড়া বিভিন্ন বিদূষীদের কায়দা কানুন আমাকে খুব স্বাভাবিক থাকতে দিতো না। এরা বেশীরভাগই ছিলেন সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর বাসিন্দা। গাড়ীওয়ালা। রাত্রি বেশী হলেও তাঁদের কোন ক্ষতি ছিল না। আমি অপেক্ষা করতাম কখন তাঁদের যাবার পর বিছানা করব, মশারী টাঙ্গাব, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে তাঁকে এত ভালবাসতেন যে মনে হত রাতটাও কাটিয়ে ফিরলে ভাল হত। আমার ছিল অল্প বয়স। মাথায় ঢুকলো এ বাড়িতে আর নয়। এই সমাজে আমার ঠাঁই নেই। অগত্যা কোনো গ্রামে চাকরীর আবেদন করলাম। **Interview** হয়েছিল কিনা ঠিক মনে নেই। পুরুলিয়ার লক্ষ্মণপুরে যোগদা সৎসঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরী পেয়ে গেলাম। আমার যাবার কথা। শ্রীপ্রীতিকুমার তাঁর চিরাচরিত স্বভাবানুযায়ী চুপ। তবে হয়ত ভাবছিলেন আমি যাব না। কিন্তু আরেক দিনের কোনো ঘটনায় আমি একেবারে **Taxi** ডেকে ফেললাম। শ্যামবাজারে **Phone** করলাম আমি লক্ষ্মণপুর রওনা হচ্ছি। বাপী জামা প্যান্ট পরে রেডি, আমি রেডি। রওনা হব হব। হঠাৎ দেখি বাড়ির সামনে **Taxi**-র পাশে একটি গাড়ি এবং শ্রীপ্রীতিকুমার নামছেন। আমি কেমন **Nervous** হয়ে আগেই **Taxi**-টা ছেড়ে দিলাম। বাপী জানে বেড়াতে যাচ্ছে। সমানে কেঁদে যাচ্ছে – "ওমা চলো, ওমা চলো।" শ্রীপ্রীতিকুমার খুব গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন, "কই, যাও!" চুপ করে বসে রইলাম, যাওয়া আমার আর হল না। ভাবলাম এ চাকরীটা আর আমার করা হল না! যে চাকরীটা করতাম সেটাও খুব গোলমেলে ছিল। হাতে আসত ষাট টাকা, সই করতে হত একশ কুড়ি টাকায়। অগত্যা বিবেকের দংশনানুযায়ী সেটা আমাকে ছাড়তে হয়েছিল।

মাথা ঠাণ্ডা হল দু-একদিনের মধ্যে। আবার সেই চিরাচরিত কালাতিপাত।

এর মধ্যে একদিন সকালে আমাদের বাড়ীর দরজায় এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক ও গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী। ঠিকানা মিলিয়ে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তো ভয়ে কাহিল। বাড়িতে এলেন, বসলেন। তারপর জানালেন তিনি স্বামী বিদ্যানন্দগিরি, পুরুলিয়ার লক্ষ্মণপুরের যোগদা সৎসঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক। আমি তো প্রায় তখনই আবার ঐ স্কুলে চলে যাইই এমন অবস্থা। তারপর স্বামীজীও আমার সাথে আলাপ করে আরও উৎসাহিত। তাঁর মতে এমন প্রাণবন্ত মেয়ের আরও বিশাল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়ে পড়া উচিত। সেই মুহূর্তে আমার শ্রীপ্রীতিকুমারের আশ্রয়

ছেড়ে যাবার একটুও সুযোগ ছিল না। অগত্যা স্বামীজী ফিরে গেলেন। তারপর দীর্ঘকাল আমার সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। আমি বলেছিলাম আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেলে চলে যাব লক্ষ্মণপুরে। তিনি শ্রীপ্রীতিকুমারকেও নিয়মিত চিঠিপত্র দিতেন। আমি বাপীকে নিয়ে লক্ষ্মণপুর আশ্রমে কয়েকদিন থেকে এসেছি। মাঝে ১৪/১৫ বছর আর কোনও যোগাযোগ নেই, কারণ আমার পাহাড়-পর্বত **NCC Programme** নিয়েই সময় বেশী কেটে গেছে। আজ এক এক সময়ে আমার খুব ইচ্ছে করে স্বামী বিদ্যানন্দ গিরির কাছে চলে যেতে। কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমারের বলা কথাগুলি মানতে হলে আমার যাবার সময় এখনও হয় নি। আরও অপেক্ষা করতে হবে।

স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি আমাকে বলেছিলেন, "তুমি লক্ষ্মণপুরে চল মা। আমি তোমাকে **Head Mistress** করে দেব। **Furnished** কোয়ার্টার দেব। তোমার কোন অসুবিধে হবে না।" কিন্তু বাপীকে তার বাবার কাছ থেকে দূরে আমি নিয়ে যেতে পারিনি। সে খুব পিতৃভক্ত ছেলে। বাবাকে ছেড়ে পৃথক ভাবে থাকতে না চাইবার মূল্য তাকে অনেক ভাবে দিতে হয়েছে।

একবার বাড়ির কাউকে কোনও কাঁচের জিনিস ভাঙ্গবার জন্য আমি 'অলক্ষ্মী' বলেছিলাম। শ্রী প্রীতিকুমার খুব রাগ করেছিলেন আমাকে। বললেন, 'তুমি অলক্ষ্মী।' আমার এত রাগ হয়ে গেল যে এ বাড়ি তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা দরকার। এই বয়সে স্বামীর উপর রাগ করে কোথায় যাব? শাশুড়ির কাছে যাওয়া চলবে না। বাপের বাড়িতে যাওয়া তো চলবেই না। বললাম, "বারাসাতের বাড়ির চাবীটা দেখি।" হঠাৎ বললেন, "বারাসাতের বাড়িতে কি করে যাবে? ও বাড়িতো আমার করা!" ব্যাস! বারাসাত আর জীবনেও না। আমার প্রকৃত উপকারী বন্ধু বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ মীরা আগরওয়াল, তার কাছে গেলাম। মীরা আমাকে দেখে অবাক! আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, "আমি তো আছি। তোর কোথাও যেতে হবে না।" মীরার দিদি, মেজদি সবাই আমার দুঃখে কাতর। স্ত্রীকে অলক্ষ্মী বলবার ক্ষোভ তাঁদের মধ্যেও প্রকাশ পেলো। আমার তখন মনে হচ্ছে, আহা! স্বামীর বকুনীর কথা না বললেই পারতাম। কথায় কথায় কত কিই হয়! একরাত গেল, দু'রাত গেল, তখন আমার মাথা বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। তখন মনে হচ্ছে, 'একবার আমার খোঁজ নেওয়া যায় না?' তৃতীয় দিন দুপুরে কেবল মীরাকে ভদ্রলোকের বেআক্কেলেপানার অভিযোগ জানাচ্ছি - হঠাৎ দেখি সামনে বাপী। খোঁজ করে ঠিক মীরার বাড়ীতে পৌঁছেছে। আমার তো প্রাণে জল এলো, সম্মান বাঁচলো। বাপীর সঙ্গে বাড়িতে ঢোকার আগেই দেখি

শ্রীপ্রীতিকুমার হাত জোড় করে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, "ও কথাটা বলা আমার ভীষণ অন্যায় হয়েছে। আর কখনও বলব না।" ..... সত্যিই আর বলেন নি আমাকে। তক্ষুণি কাজের লোকেদের মধ্যে ব্যস্ততা পড়ে গেলো। কেউ চা করতে ছুটলো, কেউ খাবার আনতে ছুটল। যেন গত তিনদিনে কোনও অঘটনই ঘটেনি। শ্রীপ্রীতিকুমার খুব গোপন কথা বলবার মতো করে কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি কথা বল তো! এই দুদিন তুমি মীরার কাছে একেবারে নিরামিষ খেয়ে কি করে ছিলে? খুব কষ্ট হয়েছে তো?" তক্ষুণি বাপীকে আমার জন্য Special মাছ আনতে পাঠালেন। শাড়ী কিনবার টাকা পূজার সময় কিম্বা নববর্ষে নিয়ম করে দিতেন, কিন্তু খাওয়ানোর ব্যাপারে তাঁর কোনও কার্পণ্য দেখিনি। কিছু খেতে চাইলেই হত, সঙ্গে সঙ্গে টাকা বের করে দিতেন। শুধু আমাকেই নয়, বাড়ী শুদ্ধ সকলকেই।

গত ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬ তিনি চলে গেলেন বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ। দুপুর দেড়টার সময় হঠাৎ আমার সঙ্গে সামান্য তর্কাতর্কি হল। রুটি একটু মোটা হয়েছিল বলেছিলেন। আমি জবাব দিয়েছিলাম, "সাধ্যমত ভাল করবার চেষ্টা করি, হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলে কি করব?" হঠাৎ রেগে উঠলেন, "রুটি একটু মোটা হয়েছে বলেছি তো কি হয়েছে?" আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, "মাতৃ-অভিশাপে সারা জীবন একটু শান্তি পেতে দেখলাম না।" ..... খুব জোরে বলে উঠলেন, "আমার মা আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন তো তোমার কি হয়েছে?" আমিও উত্তর দিলাম, "আমারই তো সব কিছু! নিজের সঙ্গে আমার জীবনটা তো ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। নিজে সুখে শান্তিতে না থাকলে আমি সুখে থাকব কি করে?" হরিদ্বার থেকে গীতাদির আনা কম্বলটা ঐ ভরদুপুরে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। অসাধারণ সংযম ছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা মুখ বন্ধ করে থাকতে পারতেন। আমার তো কড়া কথা বলে খুব কষ্ট হচ্ছে। বেলা আড়াইটা নাগাদ নিঃশব্দে গিয়ে মুখের ঢাকাটি খুলে ফেললাম। নাকটি ধরে টানতেই সে যে কি অপূর্ব করে হাসলেন যা মনে করলে এখনও আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে ওঠে! ঐ হাসিটি আমার সম্বল।

আমার শুধু মনে হয় যে ব্যক্তি অমন সত্যদ্রষ্টা, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, তিনি কি জানতেন তিনি আর সশরীরে এ পৃথিবীতে থাকবেন না। সেদিন অন্তত আমি তাঁকে ঐ মাতৃ অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম না। অপরাধের অনুশোচনা আমাকে তিলে তিলে শেষ করে ফেলতে চায়। শুধু ক্ষমা চাই। আর তো কিছু

করবার নেই। ক্ষমা যে পেয়েছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। না হলে এই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলি কাটিয়ে উঠতেই পারতাম না, আমার কাছে এখন আর শ্রীপ্রীতিকুমার আর ঈশ্বরের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। সব একাকার হয়ে গেছে। তাই আমার বিশ্বাস - যে ভক্তি ভালবাসা, শ্রদ্ধা নিয়ে গত ত্রিশ বছর একসাথে চলেছি তা ব্যর্থ হবে না। তাঁর কৃপা আমি পাবই।

– – – – – – – – –
(** রচনাকাল - জুলাই, ১৯৮৯)

যোগবাণী **পরমহংস যোগানন্দ**

(অনুবাদকঃ শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি)

প্রশ্নঃ- স্বপ্নের কোন তাৎপর্য আছে কি?

উঃ- স্বপ্নের প্রচুর মূল্য আছে। অজ্ঞানীর নিকট সবই অমূলক। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অর্থ আছে সব কিছুরই। জগৎ-প্রপঞ্চ ও মন-বুদ্ধি উভয়েরই অর্থ আছে।

স্বপ্নরাজ্যে জাগ্রত জীবনের পরিসীমা রূপ সব বাধাবিঘ্ন অপসারিত। কারণ আমরা জীবাত্মা; আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত দিব্য ক্ষমতা রয়েছে এবং সেই শক্তি আমরা প্রয়োগ করি স্বপ্নরাজ্যে। চেতন মনে আমরা যা' সৃষ্টি করতে পারিনা স্বপ্নকালে আমরা তা' সৃষ্টি করবার সুযোগ পাই অবচেতন মনে। স্বপ্ন থেকে আমরা একটি শিক্ষা পাই যে, মন সর্ব-শক্তিমান এবং এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে মন-বুদ্ধির সংকল্পের দ্বারা। তা না হলে স্বপ্ন রাজ্যে মন কিরূপে এ সকল সৃষ্টিও প্রকাশ করত যা'র প্রত্যেকটি দেখতে পাওয়া যায় এই পরিদৃশ্যমান জগতে।

জগতে এমন বস্তু নেই যা' বাস্তব আকারে আমরা সৃষ্টি এবং ভোগ করতে পারি না স্বপ্নরাজ্যে। কিন্তু আমরা যখন জেগে উঠি, দেখতে পাই স্বপ্নের সমস্ত অভিজ্ঞতাই মিথ্যামাত্র; তা' হ'লে কিরূপে আমরা জানব যে, জাগ্রত অবস্থায় বা বাস্তব জীবনে যা' আমরা দেখছি, শুনছি- তাই সত্য? যখন স্বপ্ন

DO NOT COPY

দেখি, পার্থিব জীবন মিথ্যা মনে হয় – আর যখন জেগে থাকি, তখন স্বপ্নকে মনে হয় মিথ্যা। আমরা যেন বিচরণ করছি এক স্বপ্নরাজ্য থেকে অপর স্বপ্নরাজ্যে।

যখন আমাদের কল্পনা খুব গভীর হয় তখনই আসে ভ্রান্তি (hallucination); আর আমরা মনে করি বাস্তবিক কিছু দেখি। ভ্রান্তি ও দিব্যদর্শনের মধ্যে তফাৎ এই যে, ভ্রান্তির কোন অর্থ নেই কিন্তু দিব্য-দর্শনের অর্থ এবং মূল্য উভয়ই আছে।

স্বপ্নের আর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। স্বপ্ন আমাদের কোন কোন বিষয় ইশারায় দেখিয়ে দেয়, কোন কোন বিষয়ে করে দেয় সতর্ক। আমাদের জানতে হবে মনের বিভিন্ন স্তরে কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বপ্ন উৎপন্ন হয় স্বপ্নরাজ্যে। সাধারণতঃ মিথ্যা স্বপ্ন সৃষ্টি করে অবচেতন মন। আর অধিচেতন মন সৃষ্টি করে সু-স্বপ্ন তথা সত্য বিষয়ক স্বপ্ন। অধিচেতন মনের স্বপ্ন বলে দেয় যা' কিছু ঘটবে বা ঘটেছে সেই সত্য সম্বন্ধে। অবচেতন মনের বা চেতন মনের স্বপ্ন কদাচিৎ সত্য হয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে ভাসা ভাসা গোলমেলে ধরণের সন্দেহ ব্যঞ্জক। অবচেতন মনের এই যে সন্দেহ ব্যঞ্জক মিশ্র স্বপ্ন তা' আমাদের সাবধান করে দেয় দুঃখ ও ভয়ে মনের পর্দার উপর যে হালকা ও আবছা মানসিক দৃশ্যপট উৎপন্ন হয় তার বিরুদ্ধে।

চিন্তাগুলোই অভিনেতা। এরা কল্পনার রঙ্গমঞ্চে পাখা উড়িয়ে অভিনয় করে। এরা মনের মধ্যে যে অভিনয় করে তাই অভিনীত হয় স্বপ্নরাজ্যে। স্বপ্ন চিন্তার বাস্তব-মূর্ত্তি এবং দিব্য-দৃশ্য কেবল যে মনের মধ্যে চিন্তারাজির বাস্তব মূর্ত্তি তা নয়, পরে তা জগৎ-মঞ্চেও হয়ে থাকে অভিনীত। দিব্য-দর্শনে আমরা কোন কোন ঘটনা দেখি, পরে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় এবং জগৎবাসীও তা' দেখতে পায়।

প্রশ্নঃ- পদার্থের যথার্থই অস্তিত্ব আছে কি? এরা কিসের তৈরী?

উঃ- মানুষের মনে পদার্থের অস্তিত্ব এবং অনুভূতি উভয়ই আছে। কিন্তু মানুষ তাত্বিক গবেষণা দ্বারা, যুক্তি-বিচারের দ্বারা এবং কতকগুলো প্রয়োগের দ্বারা এটা আবিষ্কার করেছে যে, সমস্ত নশ্বর এবং মায়াপ্রসূত জাগতিক সৃষ্টির পশ্চাতে বা মূলে রয়েছে শাশ্বত এবং অপরিবর্ত্তনীয় সৃষ্টিকারী এক মহতী শক্তি, যেমন দৃশ্যমান একখন্ড বরফ টুকরোকে রূপান্তর করা যায় সেই অদৃশ্য শক্তিতে। এই সত্যকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি – যেমন সমুদ্রের অস্তিত্বের সত্যতা

আমরা জানি যদিও প্রতিটি তরঙ্গের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, যে তরঙ্গ উদ্বেলিত বিশাল সেই সমুদ্রজাত। তরঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই সমুদ্র ছাড়া কিন্তু তরঙ্গহীন সমুদ্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে। দিব্য-মানসিক-শক্তি বা ব্রহ্মশক্তি ছাড়া বস্তু অস্তিত্বহীন; কিন্তু ব্রহ্মশক্তি থাকতে পারে বস্তু ছাড়াও। এসব ধারণা বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যেতে পারে কিন্তু তত্ত্বগতভাবে তথা আত্মিকভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন সাধক আত্ম-শক্তি দ্বারা কোন বস্তুকে চিৎ-শক্তিতে এবং চিৎ-শক্তিকে পরম ব্রহ্মে লীন করার চরম আত্মজ্ঞান লাভ করে। বস্তুতপক্ষে পদার্থের অস্তিত্ব নেই এরূপ আত্মজ্ঞানীদের কাছে; কেননা তাঁরা দেখতে পান সর্বব্যাপী একই অক্ষয় অমর পরমাত্মা রয়েছেন সমস্ত সৃষ্টি-তরঙ্গের অন্তরালে।

সমস্ত পদার্থের উপাদানই হল কম্পন। বিরানব্বইটি (অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে আরও বেশী, এ পর্যন্ত ১১৮ টি) মৌলিক ধাতু যা বিশ্বে উপাদানরূপে প্রবেশ করেছে মহাবিশ্ব থেকে মানবের কাছে, আর বিদ্যুৎ-কণিকা সমূহের বিভিন্ন প্রকারের কম্পন বই কিছুই নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ- বরফ অতি শীতল; এর ওজন আছে; আছে আকার এবং এ চোখে দেখা যায়। অগ্নিসংযোগে গলে পরিণত হয় জলে। জল তড়িৎ-চালনা দ্বারা বিশ্লেষণ করলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন রূপ মৌলিক উপাদানে পরিণত হয় এবং এরা বিদ্যুৎ-কণিকার কম্পন বই কিছু নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা যায়, বরফ অস্তিত্বহীন যদিও বরফ সকলেরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যেমন বরফ দেখা যায়, স্বাদ গ্রহণ করা যায়, স্পর্শে অনুভব করা যায় এর শৈত্য ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এর সত্তা নিহিত রয়েছে অদৃশ্য ইলেক্ট্রন, প্রোটনে বা ধনাত্মক, ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণিকায় অথবা বলা যায় অদৃশ্য শক্তিতে। অন্য কথায় বলা যায়, যাকে অদৃশ্যে বিলীন করা যায়, তার অখণ্ড বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই যুক্তিতে বলা যায় পদার্থ অস্তিত্বহীন। কিন্তু এটা সত্য শুধু এই যুক্তিতেই, কারণ বস্তুর আপেক্ষিক অস্তিত্ব রয়েছে; অর্থাৎ মনের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু বর্তমান। আরও বলা যায় বস্তু অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি তথা জ্যোতির ঘনীভূত অবস্থা বা স্থূল-প্রকাশ এবং সেই শক্তি অস্তিমান কারণ অক্ষয় এবং অমর। সুতরাং বস্তুও বিদ্যমান।

যেমন সন্তানের উৎস পিতামাতা তেমনি পদার্থের অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভরশীল। এর সৃষ্টি ব্রহ্মার দিব্যমনে এবং এ প্রত্যক্ষীভূত হয় জীব-মনে। বস্তুতে এবং বস্তুর কোন অস্তিত্বও নেই, সত্যতাও নেই। হিন্দু-দর্শন তথা সনাতন দর্শন অনুসারে জগৎ এবং ব্রহ্মার লক্ষণ এর সেতু-বন্ধন করছে মহা শক্তি। তদ্রূপ বরফ এবং অদৃশ্য বাষ্পের সেতুস্বরূপ হচ্ছে জল। জল এবং বরফ উভয়েই

অদৃশ্য বাষ্পের ক্ষণস্থায়ী স্থূলরূপ। অনুরূপে জীবের চেতন-মন এবং উভয়েই চৈতন্য-সত্তার স্থূলরূপে বহিঃপ্রকাশ। বস্তুতপক্ষে, একমাত্র ব্রহ্মশক্তি-ই নিত্য।

প্রশ্নঃ- আপনি কি মনে করেন ইহ-জীবনের পর পর-জীবন আছে?

উঃ- এটা সত্য বলে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, মৃত্যুর পরও জীবন অবিরাম স্রোতে প্রবহমান থাকে। উদ্দেশ্য আমাদের জীব-চৈতন্যকে ব্রহ্ম-চৈতন্যে মিলন; তথা একই জীবন সূত্র, একই নিয়ম, একই ছন্দ, একই বোধ-সত্তা খুঁজে বার করা যাতে সকলকে মহামিলনের দ্বারা একতাবদ্ধ করা যায়। বা সত্তায় আনা যায়। ব্রহ্ম চির নতুন, অনুচ্ছিষ্ট; সুতরাং ব্রহ্ম রুদ্ররূপে অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন যাদুদণ্ড দ্বারা মৃত্যুরূপ করাল গ্রাসে গ্রাস করে আবার সৃষ্টিকারী ব্রহ্মারূপে সব ব্যক্ত করান, নবরূপে পুনর্গঠিত করান, সৃষ্টিকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে নব নব রূপে সাজান।

এখানে জীবন আপেক্ষিক। কতকগুলো জীবন-তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত বেশি দিন থাকে; কিন্তু এদের প্রত্যেককেই বিভিন্নভাবে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হয় এক পরমাত্মাকেই। এদের সকলেরই উৎপত্তি এবং লয় ব্রহ্ম সাগরে। তারকার ক্ষুদ্র ধূলিকণা, সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, রামধনু, ঊর্ণনাভের সূক্ষ্ম সূত্র, রাতের পাখী পাপিয়া সকলের প্রকাশিত মৌন-পরমব্রহ্ম দ্বারা।

জীবন জড়-চেতন রূপে নিদ্রিত থাকে জড়ে; পুষ্পেতে থাকে সুখময় স্বপ্নাবস্থায় অর্থাৎ উদ্ভিদে প্রাণ-স্পন্দন স্পষ্ট; পশুতে জেগে উঠে প্রাণশক্তি নিয়ে, আর অসীম সম্ভাবনা নিয়ে সচেতন মনন শক্তি সহযোগে প্রকাশ পায় মানুষে। পরমাত্মা কোটি কোটি পুষ্প রাজি তথা জীবে অভিব্যক্ত হন সসীমরূপে। মৃত্যুর বাহ্য-ব্যাপার, অথবা পরিবর্তনশীলতার বিভ্রান্তি প্রতিফলিত হয় সমস্ত অনিত্য বস্তুতে; তা না হলে পরমাত্মাই সীমাবদ্ধরূপে পরিগণিত হত এবং সীমাবদ্ধ অনিত্য বস্তু দ্বারা তাঁর পরিমাপ করা সম্ভব হত। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম তাঁর অসীমত্ব হারিয়ে হতেন সসীম, সুনির্দিষ্ট, পরিবেষ্টিত তথা আকার বিশিষ্ট।

মৃত্যু একটি দিব্য-চুল্লী যাতে সমস্ত বস্তুর তথা প্রাণীর কর্মফলজনিত আবর্জনা পরিশোধন করা হয়। যথাযথ কর্তব্যরত প্রাণীর ক্ষেত্রে মৃত্যু আসে একে উন্নতস্তরে উন্নীত করার জন্য। আর অসফল প্রাণীর কাছে আসে তাকে আরও একবার সুযোগ দেওয়ার জন্য অন্য পরিবেশে। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন মৃত্যু অশেষগুণে নিরাপদ আশ্রয়। পরমাত্মাকে প্রকাশ করবার জন্য যখন প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি মানুষ তার সুনির্দিষ্ট কর্মভোগ সমাপন করে তখন আসে স্বাভাবিক মৃত্যু।

যখন অপরিণত মৃত্যু কোন তরুণকে গ্রাস করে তখন বুঝতে হয়, সে তার রুগ্ন দেহকে পরিবর্ত্তন করে কোথাও অবস্থান করছে ভাল সুযোগের অপেক্ষায়।

তাই আমরা দেখি সুন্দর গোলাপ এবং গৌরবময় যুবক, পরমাত্মার কিছু গুণ অভিব্যক্ত করে শান্ত-তরঙ্গ রূপে বিলীন হয়ে যায় অনন্ত জীবন সমুদ্রে। নব-জীবনের রঙ্গমঞ্চে নতুন অভিনয়ের জন্য জীবাত্মারূপ অভিনেতাকে নতুন সাজে সাজিয়ে দেয় মৃত্যু। সর্বোপরি অপেক্ষাকৃত ভাল পরিবর্ত্তিত বাসস্থানে অবস্থান্তরের জন্য মৃত্যু একটি উপায়। যাঁর দিব্য-জ্ঞান লাভ হয়েছে তিনি দেখতে পান যে জাগতিক জীবন অবসানে নতুন দিব্য জীবনের সূত্রপাত হয়।

প্রশ্নঃ- অলীক কল্পনা(Hallucination) কোন বাস্তব সত্য বলে মনে হয়?

উঃ- যখন তুমি একটি ঘোড়া অথবা একটি বাড়ীর কল্পনা কর, তখন তুমি তা বাস্তবে দেখতে পাও না। কিন্তু সেই চিন্তন যখন ঘনীভূত হয়, তখন তা স্বপ্নে দেখতে পাও অবচেতন বা অচেতন অবস্থায়। যখন তুমি কোন বস্তুতে বা বিষয়ে গভীরভাবে মন একাগ্র কর জাগ্রত অবস্থায়, তখন তুমি সেই বস্তু প্রথমে মুদ্রিত নয়নে দেখতে পাও এবং পরে দেখতে পাও খোলা চোখে। কোন বস্তুতে মন একাগ্র করলে যদি তা বন্ধ অথবা খোলা চোখে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে একাগ্রতায় জন্মেছে উৎকর্ষতা। অপরপক্ষে, কোন বস্তুকে যদি দেখতে সুরু কর বন্ধ অথবা খোলা চোখে জাগ্রত অবস্থায়, অথচ তা দেখতে চাও না, তবে এ অবস্থাকে বলা হয় "Hallucination" এবং তা নিশ্চিতই পরিহার করা উচিত।

যদি তুমি বোধ কর যে, চোখ বন্ধ অবস্থায় চিন্তা করলে কোন সাধুর মূর্তি দেখতে পাও, তবে একাগ্রতা আরও আরও বর্দ্ধিত করার ফলে খোলা চোখে যেমন সিনেমায় দেখা যায় সেরূপ রক্ত-মাংসহীন ছবি দেখতে সমর্থ হবে। তোমার একাগ্রতা যদি চরমে পৌঁছায় এবং তুমি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে একই তানে অবস্থান কর, তবে তুমি সমস্ত মহান পুরুষদেরই যাঁদের তুমি দেখছ, রক্ত মাংসযুক্ত শরীরেই দেখতে পাবে এবং স্পর্শ করতে পারবে তাদের দেহ। একাগ্রতার এই চরম উৎকর্ষতা তবে "Hallucination" (অলীক কল্পনা) এবং স্বপ্নের মধ্যে যেন তালগোল না পাকায়। প্রধান পার্থক্য হল-Hallucination-এর যুক্তি-সংক্রান্ত কোন অর্থ নেই, আর স্বপ্নের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

অশোকবিজয় রাহা - যেমন দেখেছি **শ্রী দিব্যজ্যোতি রাহা**

শান্তিনিকেতনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমার শৈশবে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিশিষ্ট কবি অশোকবিজয় রাহার (১৯১০-১৯৯০) সূত্রে। অশোকবিজয় ছিলেন আমার পিতামহ, আমার পিতৃদেবের ছোটকাকা। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের গুরুপল্লীর বাসিন্দা। পরবর্তী সময়ে কিছুদিন রতনপল্লী এবং তার পরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি পূর্বপল্লীর নিজগৃহ 'সুরাহা'তে কাটিয়ে গেছেন।

গ্রীষ্মের এক ভোর রাতে বোলপুর স্টেশনে প্রথমবার নেমেছিলাম পিতৃদেবের হাত ধরে। বোলপুর থেকে রিকশায় যেতে যেতে ভোরের আবছা আলোয় সেই আমার প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শন। এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম। আজকের এই নাগরিক শান্তিনিকেতনের সাথে সেদিনের সেই লাল মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা গ্রামীণ শান্তিনিকেতনের মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সেদিনের সেই প্রথম দর্শনের পর থেকে অশোকবিজয় রাহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহুবার শান্তিনিকেতনে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যলাভের সুযোগ আমার হয়েছে। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন শান্তপ্রকৃতির, স্নিগ্ধচিত্ত। শিশুদের সাথে খুব সহজেই তাদের মত করে মিশতে পারতেন। শিশুসুলভ এই মনটিকে অশোকবিজয় আজীবন সযত্নে লালন করে গেছেন। তাই হয়তো পরনিন্দা বা অসূয়া কখনোই এই অজাতশত্রু মানুষটির জীবনচর্যার অঙ্গ হতে পারেনি।

কবি অশোকবিজয়ের সাথে পরিচয় হওয়ার অনেক আগেই আমার বাল্যকালে এবং পরে কৈশোরেও আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনের এক অসামান্য গাইডরূপে পেয়েছিলাম। দাদুর সাথে শান্তিনিকেতনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানো ছিল এক বিরল অভিজ্ঞতা। তাঁর ঝুলিতে শান্তিনিকেতনের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সম্পর্কিত নানান গল্প, নানান ছোটখাটো দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ছিল। অশোকবিজয়ের সরস বাচনভঙ্গীর গুণে, তাঁর বর্ণনার মহিমায় সেগুলি শ্রোতার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠত। সদাহাস্যমুখ, সদালাপী অশোকবিজয় ছিলেন আশ্রমের সবার প্রিয় অশোকদা। আমার কিশোরবেলার সেই দিনগুলিতে তাঁর সাথে পথ চলতে চলতে, কখনো বা তাঁর বড়ির প্রশস্ত চাতালের আড্ডায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয়েছিল। একটি ঘটনার কথা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। দাদুর সাথে এক সকালে হাঁটতে হাঁটতে পথের পাশে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল

শান্তিনিকতনের সেই বিখ্যাত সাঁওতাল পরিবারের সাথে। তখনও শান্তিনিকেতনে আজকের মতো সংরক্ষণের এত বাড়াবাড়ি ছিল না। সব ক'টি ভাস্কর্যই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকত খোলা আকাশের নিচে, প্রকৃতির মতোই উন্মুক্ত হয়ে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে আমাকে সেই অপরূপ ভাস্কর্যের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে দেখে দাদু বললেন, 'এটা কার হাতে গড়া জান? চল, তোমাকে আজ সেই সিংহের সাথে আলাপ করিয়ে দেব'। বাড়ি ফেরার পথে দূর থেকে মাঠের ধারে বেশ বড়সড় একটা কুঁড়েঘর দেখিয়ে দাদু বললেন, 'ওই দেখ সেই সিংহের ডেরা'। কুঁড়েঘরের কাছে পৌঁছে দাদু 'কিঙ্করদা' বলে হাঁক পাড়লেন। দু'বার ডাকতেই কুঁড়েঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল, 'অশোকদা নাকি?' আর একগাল হাসি নিয়ে দাওয়ায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন শান্তিনিকেতনের অসংখ্য ভাস্কর্যের স্রষ্টা প্রবাদপ্রতিম রামকিঙ্কর বেইজ। আমার দু'চোখ ধন্য করে। সেদিন সেই কুঁড়েঘরের উঠোনের একপাশে বেশ বড় একটা প্রস্তরখণ্ড পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। নানান আলাপচারিতার মাঝে দাদু বললেন, 'এটা দেখে রাখ। বড় হয়ে দিল্লি গিয়ে দেখবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গেটের দু'পাশে যক্ষ-যক্ষীর দু'টি বিশাল মূর্তি আছে। যে পাথর থেকে তাদের সৃষ্টি, তারই অবশিষ্ট অংশ হল এটি'। রামকিঙ্কর বেইজের সেই যক্ষ-যক্ষীর মূর্তি নির্মাণের জন্য পাথর খোঁজার নেপথ্যের কাহিনীটিও সেদিন বাড়ি ফেরার পথে শুনেছিলাম। কিন্তু সে কথা এখানে বলতে বসলে ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাবে।

শিক্ষক হিসাবে অশোকবিজয় বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা দিয়ে শুরু করে কর্মজীবনের শেষ পর্বে তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক। আমার আজও মনে আছে এক গ্রীষ্মের দুপুরের কথা। আমি তখন নিতান্তই কিশোর। বোধ হয় গ্রীষ্মাবকাশে শান্তিনিকেতনে দাদুর কাছে গিয়েছিলাম। শান্তিনিকেতনের তদানীন্তন শিক্ষকদের অলিখিত প্রথা অনুযায়ী টোকা মাথায় দিয়ে সাইকেল চালিয়ে সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত অশোকবিজয় সবেমাত্র বাড়ি ফিরে এসেছেন। এমন সময়ে 'অশোকদা' বলে ডাকতে ডাকতে একদল ছাত্রছাত্রী এসে উপস্থিত। তারা তাদের পাঠের কোনো একটি অংশ তাঁর কাছে বুঝতে চায়। আমার আজও মনে পড়ে, এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ না করে দাদুকে দেখেছিলাম তাদের সাথে বহু সময় ধরে বসে আলোচনা করতে। শিক্ষকতার প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভালবাসা। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে, বিশেষ করে রবীন্দ্র-কাব্য ও সাহিত্যে যেমন ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, তেমনই সাবলীল ছিল তাঁর বিশ্লেষণী-দক্ষতা। তার সাথে

অশোকবিজয়ের সুগভীর রসবোধ ও অননুকরণীয় সরস বাচনভঙ্গী মিলে তাঁর ভাষণকে শ্রুতিমধুর করে তুলতো। কথিত আছে, অশোকবিজয়ের ভাষণ শোনার জন্য অন্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরাও নাকি তাঁর ক্লাসে এসে বসে থাকতো। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অশোকবিজয়ের জীবনের উপান্তে এক সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির চাতালে বসে অন্ধকারে জনাচারেক শ্রোতার উপস্থিতিতে প্রায় দেড় ঘন্টা এক নাগাড়ে তাঁকে "রবীন্দ্র-কাব্যে ধ্বনিতত্ত্ব" বিষয়ে বলতে শুনেছিলাম। উদ্ধৃতি এবং তথ্যসমৃদ্ধ সেই সরস আলোচনা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনার পরে সেই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর দক্ষতায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম। উত্তরে তাঁর বক্তব্যটি আজও কানে বাজে। অশোকবিজয় বলেছিলেন, 'আমি জীবনে আর কিছুই করিনি। শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য-সাহিত্যকে খলনুড়িতে বেটে, জল দিয়ে গুলে খেয়ে নিয়েছি'। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অশোকবিজয় রাহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় আরও পাওয়া যায় তাঁর অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলিতে। সমসাময়িক কিছু পত্র-পত্রিকা ও সংকলন-গ্রন্থের পৃষ্ঠায় যেগুলি ছড়িয়ে রয়ে গেছে।

অশোকবিজয় রাহার পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কবি অশোক বিজয়ের খ্যাতি বা তাঁর দক্ষতার সম্যক উপলব্ধি আমার অনেক পরে হয়েছিল। তাঁর কাব্যচর্চার সূত্রপাত অতি অল্পবয়সে। স্কুলজীবনেই তাঁর কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয় শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত 'কমলা' পত্রিকায়। যদিও তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন না, তবুও একলব্যের মত দূর থেকেই তরুণ অশোকবিজয় রবীন্দ্রনাথকে গুরুপদে বরণ করে বিরল চিত্রময় নতুন স্বাদের কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র অশোকবিজয়ের কবিতার খাতা পড়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাতে লিখে দিয়েছিলেন, "তোমার কবিতাগুলিকে অকুণ্ঠিত মনে ভালো বলিতে পারিলাম"। এর দু'বছর পরেই ১৯৩১ সালে তাঁর কবিতাগুচ্ছ পড়ে রবীন্দ্রনাথ আবার আশীর্বাদ করে লিখলেন,

"আকাশে চেয়ে আলোক বর মাগিল যবে তরুণ চাঁদ
রবির কর শীতল হয়ে করিল তারে আশীর্বাদ"।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি হলেও রবীন্দ্রনাথে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত হয়েই কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন অশোকবিজয় রাহা। তাঁর কাব্যরচনার মাঝে রাবীন্দ্রিক-প্রভাবকে অস্বীকার করার বা রোমান্টিকতার বিরুদ্ধাচরণের কোনো উল্লেখযোগ্য সচেতন

প্রয়াস দেখা যায় না। কল্লোল যুগের অন্যান্য কবিদের মত ভাষা এবং ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। তবে মনে প্রাণে রাবীন্দ্রিক হলেও অশোকবিজয় কিন্তু কোনো অর্থেই রবীন্দ্র-অনুসারী কবি নন। অশোকবিজয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর কবিতার চিত্রধর্মিতা। শব্দের রঙে ছবি আঁকার অসাধারণ নৈপুণ্য এবং কল্পনাশ্রয়ী আলো-আঁধারির প্রতি অমোঘ আকর্ষণ তাঁর কবিতায় এক অভিনব স্বতন্ত্র আস্বাদ নিয়ে এসেছিল। স্বকীয় ছিল কবিতায় তাঁর চিত্রাঙ্কনের বিশেষ ধরণটিও। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ কোনো অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি শুধু ছবির পরে ছবি সাজিয়ে দিয়েছেন। আর সেই ছবির মাঝেই ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের বক্তব্য। ভাবকে ছবির আকারে প্রকাশ করাতেই ছিল তাঁর সমধিক আগ্রহ। অশোকবিজয়ের নিজের কথায় – 'ভাব অর্থাৎ ইমোশনের দৃশ্যমান সিম্বল তৈরি করতে গিয়ে আমি এক-এক সময়ে পাশাপাশি সাজিয়ে দিই কতকগুলো ছবির তাস'। এইভাবে পাশাপাশি ছবি সাজিয়ে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বহু কবিতায় অশোকবিজয়ের সাফল্য প্রশ্নাতীত। উদাহরণস্বরূপ 'ডিহাং নদীর বাঁকে' কাব্যগ্রন্থের 'ফাল্গুন' কবিতাটির শেষ কয়েকটি পঙক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসুর 'আধুনিক বাংলা কবিতা'তেও কবিতাটি সংকলিত হয়েছে।

নদীর ওপারে আকাশে আবির-ঝড়,
আলতা গলেছে জলে,
হাওয়া-জানালায় চোখে মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া,
ধু-ধু হাওয়া এলোচুলে, --
দূরে এককোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।

এই প্রকার দৃশ্যরূপ অশোকবিজয়ের কবিতায় অসংখ্য পংক্তিতে ছড়িয়ে রয়েছে। আরও একটি চমৎকার উদাহরণ আছে ওই কাব্যগ্রন্থেরই 'একটি সন্ধ্যা' কবিতাটির শেষ দু'টি পংক্তিতে। প্রবাদ-প্রতিম পরিচিতি নিয়ে ওই পংক্তি দু'টি বহুদিন বিদগ্ধজনের মুখে মুখে ফিরত।

মাথার উপর ডাকল পেঁচা, চমকে উঠি আরে !
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে !

অশোকবিজয়ের সমধিক পরিচিত কবিতার নাম 'মায়াতরু'। কবিতাটি সংকলিত হয়েছিল তাঁর 'ভানুমতীর মাঠ' কাব্যগ্রন্থে। বুদ্ধদেব বসুর 'আধুনিক

বাংলা কবিতা' সংকলনে এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তির ফলে কবিতাটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

এক-যে ছিল গাছ
সন্ধে হলেই দু'হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গরগর
বিষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠত হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেল, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।

শিশুপাঠ্য কবিতা হিসাবে পরিচিত হলেও পরিণত মনের কাছেও কবিতাটির আবেদন কিন্তু সুগভীর। একটি গাছ বারংবার তার রূপ বদলে ফেলছে। এই কবিতায় গাছ একটি রূপকল্প মাত্র। মানব-মনের বিভিন্ন অবস্থায় জীবন আমাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। কখনো রহস্যময়, কখনো জরাক্রান্ত, আবার কখনো বা খুশির আলোয় ঝলমল।

ঠিক 'মায়াতরু'র মতো না হলেও মহাকাব্যিক চিত্রকল্প রচনায় অশোকবিজয়ের অগাধ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'ভানুমতীর মাঠ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বন-ভৈরব' কবিতাটিতেও।

কালনাগা-পাহাড়-চূড়ায়
বন-ভৈরবের মূর্তি বসে আছে আকাশের গায়।
বিশাল উলঙ্গ দেহ, বাহুমূলে রুদ্রাক্ষের মালা,
স্ফটিক-নির্ঝর বেয়ে ঝরে জল কমণ্ডলু-ঢালা,
প্রকাণ্ড পাথর-ষাঁড় বসে আছে কী বিশাল স্তূপ,
বহু নিচে বন হ'তে কুণ্ডলিত ওঠে মেঘ-ধূপ,
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে, তারপরে অন্তহীন রাত,
ত্রিশূল-চূড়ার কাছে দেখা দেয় একচক্ষু চাঁদ।

DO NOT COPY

অশোকবিজয়ের কাব্যজীবনের শেষের দিকের কবিতাগুলিতে স্বাভাবিক কারণেই প্রকৃতি-প্রেমকে পশ্চাতে ঠেলে ক্রমশই নাগরিক জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। হয়তো বা কবি সচেতনভাবেই তা ঘটিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, যে চিত্রধর্মিতা অশোকবিজয়ের বৈশিষ্ট্য, তা কিন্তু তখনও তাঁকে জড়িয়ে থেকেছে। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'ঘন্টা বাজেঃ পর্দা সরে যায়' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কিমাশ্চর্যম' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি বিস্ময়মুগ্ধ বা একটি বেদনামোহিত মুহূর্তও যে কোনো কোনো সময়ে কবিকে সব বিপর্যয়ের বোধ ভুলিয়ে দিয়ে জীবনের গভীর কোনো সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারে, অশোকবিজয়ের এই কবিতাটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হু হু করে ট্রেন ছোটে – চৈত্রের দুপুর
কামরায় ভীড়
পাখা নেই –অসহ্য গুমোট
রুমালে কপাল মুছে একটেরে ঠায় বসে আছি।
চোখ ফেরে এখানে ওখানে
হঠাৎ কী যেন হয়ে যায়
যেদিকে তাকাই
সকলই অদ্ভুত ঠেকে,
চুপ করে ভাবি
আমি যে হইনি ওই অন্ধ দরবেশ
কিংবা ওই নুলো
কিংবা ওই খোঁড়া ভিখারিটা
এ বড়ো আশ্চর্য কথা,
আমি যে হয়েছি আমি, আর কিছু নয়
এ বড়ো বিস্ময়।

প্রেমের, নিসর্গমুগ্ধতার, আত্মমগ্নতার উপলব্ধি যে চিরন্তন, এই সত্যের পূজারী ছিলেন অশোকবিজয় এবং তাঁর মত সুররিয়ালিস্টিক বা মিস্টিক ধারার কবিরা। শিল্পবোধ বা শৈল্পিক কল্পনা যে শুধুমাত্র কবিতার বহিরঙ্গ নয়, তার যে একটি গহন, নিবিড়, অন্তর-রূপও আছে,এই চিরায়ত উপলব্ধি সার্থক সুন্দর রূপে বিধৃত হয়ে আছে অশোকবিজয় রাহার কবিতায়। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বললে তাঁর

কবিতা হল, 'cool, dewy lyrics.' পরবর্তীকালে ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অশোকবিজয় রাহা –একটি মুল্যায়ন' প্রবন্ধে অধ্যাপক ষষ্ঠী বাগচী অশোকবিজয় রাহার কাব্যধারাকে ইংরেজ কবি Samuel Coleridge এবং Walter de la Mare-এর কাব্যধারার সাথে তুলনা করেছিলেন।

কবি অশোকবিজয়ের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দশ। সে'গুলি ছাড়াও ১৯৮৩ সালে 'The Enchanted Tree by Asokbijoy Raha' নামে শ্রীমতী লীলা রায় অনূদিত অশোকবিজয়ের নির্বাচিত কবিতার একটি ইংরাজি অনুবাদ-সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর নির্বাচিত কবিতার সংকলন 'অশোকবিজয় রাহার শ্রেষ্ঠ কবিতা'। এ ছাড়াও তিনি 'বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' এবং 'পত্রাষ্টক' নামে দুটি গদ্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী কবিতা সংকলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাগুচ্ছের পরেই অশোকবিজয়ের 'রুদ্র বসন্ত' কবিতাটি স্থান পেয়েছিল। আধুনিক কালের কবিতানুরাগীদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির বেশীর ভাগই আজ দুষ্প্রাপ্য। উদ্যোগের অভাবে সম্যকরূপে সংরক্ষিত হয়নি নানান সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর অসামান্য প্রবন্ধগুলিও।

অশোকবিজয় রাহার কাব্যচর্চার ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়, কবি হিসাবে তাঁর পরিচিতি বা খ্যাতি তাঁর জীবনের প্রাক-শান্তিনিকেতন পর্বেই বেশি ছিল। ১৯৫১ সালে শান্তিনিকেতনে যোগদানের পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে তাঁর শিক্ষকসত্বা প্রাধান্য পেতে থাকে। অধ্যাপনায় তাঁর প্রবাদপ্রতিম সাফল্য এবং কর্মজীবনের বিস্তারের চাপেই হয়তো কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল তাঁর আজন্মলালিত কবিসত্বাটি, ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল তাঁর কবিতার ধারা। আর ঠিক সেই কারণেই হয়তো এপার বাংলার তুলনায় ওপার বাংলায় কবি অশোকবিজয় অনেক বেশি পরিচিত এবং সমাদৃত। ২০১০ সালে বাংলাদেশে দু'দিন ব্যাপী তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হলেও এ'পার বাংলায় সে ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি হওয়া সত্ত্বেও অশোকবিজয় রাহা কোনো এক অজানা কারণে তাঁর জীবদ্দশাতেই পাঠকসমাজে বিস্মৃত হয়েছিলেন। বলা চলে, পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকদের কাছে কবি অশোকবিজয় সম্যক অপঠিত, অনালোচিত থেকে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়।

অশোকবিজয় রাহার প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকাঃ

কাব্যগ্রন্থঃ

‘ডিহাং নদীর বাঁকে’ (১৯৪১)
‘রুদ্রবসন্ত’ (১৯৪১)
‘ভানুমতীর মাঠ’ (১৯৪২)
‘জলডম্বরু পাহাড়’ (১৯৪৫)
‘রক্তসন্ধ্যা’ (১৯৪৫)
‘শেষ চূড়া’ (১৯৪৫)
‘উড়ো চিঠির ঝাঁক’ (১৯৫১)
‘যেথা এই চৈত্রের শালবন’ (১৯৬১)
‘ঘন্টা বাজেঃ পর্দা সরে যায়’ (১৯৮১)
‘পৌষ ফসল’ (১৯৮৩)

গদ্যগ্রন্থঃ

‘বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ’ (১৯৭৫)
‘পত্রাষ্টক’ (১৯৮১)

“যারা ঋজু নয়, তারা মায়ের সাহায্য থেকে উপকার পায় না- কারণ তারা নিজেরাই তাকে দেয় ফিরিয়ে। নিজেদের পরিবর্ত্তন সাধন যদি না করে, তবে তারা আশা করতে পারে না যে নিম্নতর প্রাণে ও শারীর-স্তরে অতিমানস জ্যোতি ও সত্য অবতরণ করবে- স্বকৃত পঙ্কের মধ্যে তারা আটকে থাকে, এগিয়ে চলতে পারে না।”

-শ্রীঅরবিন্দ

DO NOT COPY

তিনটি চিঠি **সুনন্দন ঘোষ**

শ্রী বিকাশ কুমার ঘোষ ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড। তিনি বর্তমানে কাঁকুড়গাছির বাসিন্দা, বয়স ৯৩ বছর। আমার বাবা শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষকে তাঁর ছোটবেলা থেকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র দুজন এখনও আমাদের সঙ্গে আছেন - আমার ছোট কাকু শ্রী প্রভাত কুমার ঘোষ, এবং শ্রী বিকাশ কুমার ঘোষ।

দেশবিভাগের আগে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার খুলনা জেলার অধীনে ফুলতলা উপজেলার অন্তর্গত আলকা গ্রামে ছিল শ্রী প্রীতিকুমারের পৈতৃক নিবাস। শ্রী বিকাশ কুমার ঘোষের পরিবারও ছিলেন ঐ গ্রামেরই বাসিন্দা। শ্রীপ্রীতিকুমার ছিলেন আত্মপ্রচার-বিমুখ। তাই তাঁর ব্যক্তি জীবনের সংগ্রাম ও জীবন স্রোতের প্রবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমরা জানি না। তাঁর গাম্ভীর্য ছিল এমন প্রবল যে তিনি নিজে না চাইলে বেশী কথা তাঁর সাথে বলা যেত না, মানে, অল্প বয়সে আমার অন্তত সাহস হত না।

অল্প বয়সের সেই আমাদের সঙ্গে এখনকার আমাদের মেলানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। আমরা এখন নিজের ছেলেমেয়েদের সাথে অবাধে মত বিনিময়কে সমর্থন করি, তাঁদের জন্য নিত্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করার চেষ্টা করি। আমাদের ছোট বেলায় বাইরের লোকজন তো দুরের কথা, বাড়ীর বড়দের সামনে নিজের ছেলে মেয়েকে কোলে নেওয়াটাও আদিখ্যেতা বলেই গণ্য হত। গুরুজন শব্দটাই ছিল গুরুভার। সব ক্ষেত্রেই মার্জিত দূরত্ব। অথচ স্নেহ, ভালবাসা, নজরদারির কোথাও অভাব ছিল না।

আমার বাবা অভাবের সাথে যুদ্ধ করে বড় হয়েছিলেন। সে অভাব ছিল অনেক ভয়ঙ্কর - অর্থনৈতিক অভাব। আমি বড় হয়েছি মধ্যবিত্ত পটভূমিকায়। দেখেছি আমার পিসি, কাকা, মামা, এমনকি তাঁদের ছেলে মেয়েদের প্রতি বাবার অগাধ স্নেহ, আমার ঠাকুমার প্রতি অব্যক্ত শ্রদ্ধা।

বাবার কাছেই টুকরো টুকরো ভাবে শুনেছিলাম 'নগেন দাদুর' কথা; পুর্ব বাংলা থেকে দশ বছর বয়সে শ্রীপ্রীতিকুমার কলকাতায় যাঁর বাড়িতে উঠেছিলেন। সে যুগের গ্রামীন জীবনে দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে

সম্পর্কের গভীরতা ছিল রক্তের সম্পর্কের থেকেও অনেক গভীর। আমাদের ছোটবেলাতে দেখেছি বরানগরের পাড়ায় কোন বাড়িতে কারো আকস্মিক মৃত্যু হলে পাশাপাশি অনেক বাড়িতেই হাঁড়ি চড়ত না। তাই সুদূর খুলনা থেকে কলকাতায় এসে গ্রাম-সম্পর্কিত দাদুর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

২০০৪-২০০৭ সময়কালে আমি দার্জিলিং জেলার সিকিম সীমান্তে রাম্মাম হাইডেল প্রজেক্টে যখন কর্মরত, সেই সময় 'নগেন দাদু'র ছেলে শ্রী বিকাশ কুমার ঘোষ কিভাবে কোন যোগসূত্র ধরে নাগেরবাজারের এই ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছেছিলেন আমার জানা নেই। আমি বাড়ি এসে দেখলাম আমাদের মেয়ে বাচেন্দ্রী তাঁর বন্ধু হয়ে গেছে। উনি বাচেন্দ্রীকে দিয়ে একটা ছবি আঁকিয়েছিলেন সেই আলকা গ্রামের; কোথায় ওনাদের বাড়ী ছিল, কোন বাড়ীতে আমার ঠাকুমা, কাকা, পিসীরা থাকতেন, কোথায় মাঠ, পুকুর, স্কুলের রাস্তা। জানিনা সেই আঁকাটা এখন কোথায়। তবে সময়ের সাথে সাথে আমাদের মেয়ের দৌলতে উনি আমাদের সকলের 'দাদা' হয়ে গেছেন।

আমি বহু বছর ধরেই লৌকিকতার ক্ষেত্রে অসামাজিক। পাহাড়, ফটোগ্রাফি আর পত্রিকার গণ্ডীতে আমি স্বচ্ছন্দ। আর আজকাল স্বচ্ছন্দ মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপে। কারো বাড়িতে নিমন্ত্রন থাকলে আমার শরীর খারাপ শুরু হয়ে যায়। পি ভি আর-এ আড়াই ঘন্টা বসে সিনেমা দেখতে হবে ভাবলেই কোমর দিয়ে ব্যথা নামতে থাকে। আমার কুঁড়েমিতে দীর্ঘদিনের ভালবাসার লোকেরা এখনও দুঃখ পায়; প্রথম প্রথম কেউ কেউ রাগ-অভিমান করতো, এখন সে পাট চুকে গেছে। দাদাও হয়ত আমার কুঁড়েমির ব্যাপারটা বুঝে যোগাযোগ বজায় রেখে গেছেন যথাসম্ভব।

আমার মা বহুদিন আগে বলেছিলেন বাবার নাকি ইচ্ছে ছিল তাঁর বাণীগুলো সংকলিত করে একটা পকেট-বই ছাপানোর কথা। সকলের সহযোগিতায় বাবার বিভিন্ন চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত ডায়েরি, পুরনো পার্থসারথি ইত্যাদি ঘেঁটে বাবার অনেক লেখা সংগ্রহ করেছি - কিছু প্রবন্ধ, কিছু আত্মকথা, কিছু উদ্ধৃতি যোগ্য বাণীরূপে। পার্থসারথিতে "প্রীতি-কণা" শিরোনামে বাণীগুলো নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তাই ভেবেছিলাম মূল ম্যাটার তো কম্পোজ করাই আছে, কোভিডের যন্ত্রণা মিটলে "প্রীতি কণা"-কে বইয়ের রূপ দেবো। গত মে মাসে

(২০২২) বিকাশ দাদার ফোন এলো। সার্ভারের সমস্যায় কথাগুলো অস্পষ্ট -- উনি একটা বই ক্যুরিয়ারে পাঠাচ্ছেন। বিকেলেই ক্যুরিয়ার এল। মোড়ক খুলে দেখি একটা ছোট বই ও তার শতাধিক কপি -- "প্রীতিকণা সংগ্রহ।" স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বিকাশদাদা এই কাজটি করেছেন তাঁর ভণ্ডুলদার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে।

কার ক্রুশ কে বহন করে!!!

আমার ঠাকুরদা প্রদ্যোত কুমার ঘোষের পিতা প্রভাস ঘোষ ছিলেন খুলনার ফুলতলা হাইস্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অথচ আমার ঠাকুর্দার অকাল মৃত্যুর পর জ্ঞাতিদের বঞ্চনার পরিণতিতে আমার ঠাকুরমা নাবালক ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিদারুণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার শিকার হন। আমার বাবা শ্রীপ্রীতিকুমার ছিলেন বড় ছেলে। বয়স যাই হোক সংসারের দায় বহন করার অলিখিত সামাজিক দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর উপর।

অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বছর দশেক বয়সে তাঁকে একা কলকাতায় চলে আসতে হয়। সেখান থেকে যান বম্বে, বম্বে থেকে পণ্ডিচেরী, আবার কলকাতা। এর মাঝখানে সাধনার প্রয়োজনে তিনি বিন্ধ্যাচল গেছেন, তারাপীঠ, কল্যাণেশ্বরী ইত্যাদি সাধন ক্ষেত্রে গেছেন, আবার স্বামী প্রণবানন্দ, শ্রী রামঠাকুর প্রমুখ মহাপুরুষদের সঙ্গলাভ করেছেন। সবটাই প্রায় একা একা। তাই তাঁর ভাই, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন - কারো কাছেই কালানুক্রমিক তথ্য নেই।

বাবার ডাক নাম ছিল ভণ্ডুল। বড় পিসীর কাছে শুনেছিলাম বাবা তাঁর বাল্যকালে খুব চঞ্চল ছিলেন। কাজ ভণ্ডুল করে দিতেন, তার থেকেই ঐ নাম, সম্ভবতঃ ঠাকুরদার দেওয়া। আমার ঠাকুমা আর বড় পিসীকে শুনেছি বাবাকে ভণ্ডুল নামে ডাকতে। আত্মীয়দের কেউ কেউ ভণ্ডুল দা বলতেন। আমার মামা-মামীরা ডাকতেন 'রাজকুমার দা' বলে।

এই বছরেই এপ্রিলে বিকাশ দাদার দুটো চিঠি পোস্টে পেয়েছিলাম। স্বল্প পরিসরে স্মৃতিচারণ। তখন ওনাকে অনুরোধ করি বাবার বিষয়ে আর একটু কিছু লেখার জন্য। ৯৩ বছর বয়সেও দাদা আমার কথা রেখেছেন - তৃতীয় চিঠিটিতে অতীতের কিছু অজানা ঘটনাকে তুলে ধরে। ওনার তিনটি চিঠিই

DO NOT COPY

এখানে সঙ্কলিত করলাম আর অন্যদের সুবিধের জন্য আমার জানা কিছু তথ্যের সংযোজন করলাম।

মার্চ, ২০২২

কল্যাণীয়েষু সুনন্দন, কল্যাণীয়াষু সোমা,

গত ১০ই মার্চ শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষের জন্মবার্ষিকীতে প্রণতি জানিয়ে খবরের কাগজে তোমাদের insertion টা দেখে এবং পড়ে খুব ভাল লাগল। প্রতিবছরই তো দেখি। কিন্তু এবার আমাকে আলকা গ্রামের স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলোতে পৌঁছে দিল। শ্রদ্ধেয় ভুণ্ডুল দা, দুটো ছোট ভাই মন্টু, সন্টু, তাদের দিদিদের (নামগুলো গুলিয়ে ফেলছি বলে লিখলাম না,) এমনকি school এ যাবার সময় বউদির হাতে তৈরি গরম পায়েস খেয়ে যাবার ছবিও মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। ভুণ্ডুল দা গ্রাম ছাড়ার পর কিছুদিন East Bengal Rly Sealdah Station-এ কাজ করার পর Bombay তে চলে যান আমার এক জ্যেঠতুত দাদার Electric business এ সাহায্য করার জন্য। সেখান থেকে সোজা Pondicherry Aurobindo Ashram। এর পরে আর track রাখতে পারিনি।

কর্মজীবনে প্রবেশ করতে আমাকেও দেশ ছাড়তে হয় (দেশ বলতে আমি পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতাকে বোঝাতে চাইছি)। এই সব কারণে সাধক শ্রীপ্রীতিকুমারের সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কলকাতা দিয়ে যাতায়াতের মধ্যে সুভাষ বলে আমাদের গ্রামেরই একটি ছেলে আমাকে তোমাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তখন শ্রীপ্রীতিকুমারকে ঘিরে সারা ঘর ভক্তে ভর্তি। দরজার বাইরে থেকে হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে চলে আসতে হয়। আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসেছিলেন মনে আছে।
কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে ১৯৮৭ সালে আমি কলকাতায় বাস করতে আসি। আমার দুর্ভাগ্য তার আগের বছরই শ্রীপ্রীতিকুমার ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না তোমাদের বর্ত্তমান বাড়ীর ঠিকানা অথবা Contact no. কিভাবে পেয়েছিলাম। সেখানে আমার little friend এর সঙ্গে পরিচয় হয় - নাম বাচেন্দ্রী। তোমার সঙ্গে কবে প্রথম দেখা হয় মনে নেই। তবে বাচেন্দ্রী তার একটা চিঠিতে তার পিতৃদেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। চিঠিটা এত সুন্দর করে লেখা - আজও আমার চিঠির Album এ জ্বলজ্বল করছে। সেই

চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃতি নীচে দিলাম। আমি Little Friend কে একটা চিঠি দিয়েছিলাম English-এ। তার উত্তর দিয়েছিল চমৎকার English-এ।

"The letter from you was unexpected to me and I am overwhelmed to get it."

আমি হয়ত লিখতে বানান ভুল করেছিলাম। Bachendri আমার ভুল এইভাবে শুধরে দিল-

"The spelling of my name is 'PRACHETA'....."

এবার তার পিতৃদেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া--

"I am also proud of my father. He is not only an Engineer but also a good photographer, a good mountaineer, a good writer, a good poet and above all a good man. He also have a good sense of humour. Till now he is in Darjeeling District. He is expected to come back after April 2007. I will inform you after he joins his office at Barrackpur."

"I am eager to know more about the village 'ALKA'....."

"I have received your letter a few days back. I am sorry as I am late to write to you..."

এইভাবে চিঠিটা শেষ করেছে -

"Let me conclude to day. My best regards to you and all other seniors.
Yours
Bachendri"

A wonderful letter from my little friend. সারা জীবনে এখন পর্যন্ত যত ভাল লেখা চিঠি পেয়েছি সেগুলো আমার Photo-cum-letter album এ রাখা আছে। আমি কয়েক বছর বিদেশে ছিলাম। সেখানকার বন্ধুদেরও কিছু চিঠি রক্ষণ করা আছে।

এবার একটু বিষয়ান্তরে যাই। শেষবার যখন তোমাদের বাড়ি যাই, তোমার মাতৃদেবী খুবই অসুস্থ ছিলেন। এক জন মহিলা সহায়িকা ২৪ ঘন্টা কাছে

DO NOT COPY

থাকতেন দেখেছিলাম। প্রয়াণের পর পারলৌকিক ক্রিয়াকার্যের বিবরণ দিয়ে যে চিঠি পাঠিয়েছিলে – নিয়মভঙ্গের তারিখ-এর ৩ দিন পর আমার বাড়ি পৌঁছেছিল। (courtesy কলকাতার postal system). আমার ত্রুটি হয়েছিল প্রাপ্তি খবরটা দিতে পারিনি।

সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডও পেয়ে গেছি। আমার Little friend school, college শেষ করে Engineer হয়ে I.B.M. Pune তে কাজ করছে সে পর্যন্ত খবর পেয়েছি। কিন্তু তারপর বিবাহ অনুষ্ঠানের খবরটা পেলাম অন্য source থেকে অনেক পরে। নিজের ত্রুটিপূর্ণ কাজের দণ্ড তো পেতেই হবে। নতুন জীবনে প্রচেতারা সুখে থাকুক এ প্রার্থনা সব সময়েই থাকবে।

ইতি আঃ বিকাশ দাদা

পুঃ এখন লিখতে গেলে হাত কাঁপে। বানান ভুল হয়, ভাষা খুঁজে পাইনা। এই ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়ো।

০১.০৪.২০২২

কল্যাণীয়েষু সুনন্দন, সোমা,

'প্রীতি কণা সংগ্রহ' কয়েকটা কপি আমার হাতে এসেছে। ১০ই মার্চের আগে আসবে Programme করেছিলাম। কিন্তু আসেনি। 'God disposes' সত্য হল। Get-up টা আমার পছন্দ হয় নি। 2nd hand, 3rd hand এর মধ্য দিয়ে সব কাজ করতে হয় – আমি নিজে যেতে পারিনা। তবে contents ঠিক আছে বলে মনে হয়। যে দেখছে, পড়ছে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 'গীতা'র মত বাড়িতে রাখতে চায় even for posterity. যতগুলো রাখতে পেরেছি পাঠালাম। যে যে ভক্তরা শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে আসতেন তাঁর বাণী শুনতে তাঁদের এই compilation ভালো লাগবে বলে আশা করি। আমি যতটা যোগাড় করতে পেরেছি প্রতিমাসে সোমার প্রেরিত পার্থসারথির copy থেকে, সেগুলিই ছাপতে দিয়েছিলাম – 'প্রীতিকণা'র কয়েকটা অংশ মাত্র। তবে একই সঙ্গে বাণীগুলি পেলে ভক্তদের ভাল লাগতেও পারে, এই আশা নিয়ে তোমাকে পাঠালাম।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ।

ইতি আঃ বিকাশ কুমার ঘোষ

DO NOT COPY

১৭.০৪.২০২২

কল্যাণীয়েষু সুনন্দন,

আমার মনে আসছে একটা mobile message এ তোমরা জানতে চেয়েছিলে শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ এর সঙ্গে সামাজিকভাবে আমার কি সম্বন্ধ বা আমি তাঁকে কতটা জানি বা চিনি, এইরকম কিছু। প্রথমেই বলে রাখি শ্রীপ্রীতিকুমারকে চেনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমরা যাঁকে চিনতাম তিনি আমাদের ভুণ্ডুলদা, to be precise, আমার থেকে তিন বছর তিন মাসের বড়।

গ্রামগুলো পাড়ায় বিভক্ত ছিল। ঘোষ পাড়া, বোস পাড়া, দত্ত পাড়া ইত্যাদি। আমার যতদূর মনে আছে ঘোষ পাড়ায় তিনটি family বাস করতেন। আমাদের family, ভুণ্ডুলদার family এবং আরেকটা family, নাম মনে নেই। প্রত্যেক বাড়ীর আশেপাশে একটা, দুটো ছোট বড় পুকুর ছিল, ধানি জমি, বড় বড় গাছের বন বা জঙ্গল ছিল। তখনকার গ্রামের engineer – রা রাস্তার planning এমনভাবে করেছিলেন যাতে একটা গরুর গাড়ী প্রত্যেক বাড়ীর কাছাকাছি যেতে পারত। বাকিটা জঙ্গল হোক, পুকুর পাড় হোক হাঁটা রাস্তা দিয়ে যুক্ত ছিল।

এবার আসি পর্য্যায় বা Generation এর হিসাবে। আমাদের বংশের পর্য্যায়ের হিসাব অনুযায়ী আমার পিতৃদেব, জ্যাঠামশাইরা ছিলেন ২৫ পর্য্যায়ের, আমরা ২৬ পর্য্যায়, আমাদের ছেলেমেয়েরা ২৭ পর্য্যায়ের। আমার মেজ জ্যাঠামশাইয়ের দুই ছেলেদের ভুণ্ডুলদা ডাকতেন গৌর কাকা, কুড়োম কাকা, (ডাকনাম)। সেই সূত্রে আমিও ভুণ্ডুলদার কাকা পর্য্যায়ে পড়ি – তবে বয়েসে ছোট হওয়ায় আমি ভুণ্ডুলদাকে দাদা বলে ডাকতাম। এই হিসাব সত্য ধরলে ভুণ্ডুলদার পর্য্যায় ছিল ২৭, তুমি তাহলে ২৮, প্রচেতা ২৯। বিবাহাদি অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পুরোহিত মশাই জানতে চান। তবে এখনকার Generation এর অনেকের কাছেই এই information নাও থাকতে পারে। এই হিসাব তোমরা চাওনি। এবার আসল কথায় আসায় যাক। আমি ভুণ্ডুলদাকে কতটা জেনেছিলাম বা চিনতাম, তাহলে কয়েক বছরের ইতিহাস সংক্ষেপে বলেনি।

আমি Class VII পর্য্যন্ত কলকাতার স্কুলে পড়াশোনা করেছি। গরমের ছুটি ও পুজোর ছুটির ২মাস গ্রাম আলকায় কাটাতাম। সেই সময় ভুণ্ডুলদার

DO NOT COPY

সঙ্গে সময় কাটিয়েছি, খেলাধূলায় অংশ নিয়েছি। আমাদের nearest neighbour হিসাবে। গ্রামের সরকার বাড়ীতেও আমাদের বয়েসের তিন চারজন ছিলেন খেলাধূলার অংশ নিতে। ১৯৪০-৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রটনা হল জাপানীরা কলকাতায় বোমা ফেলার আয়োজন করছে। কলকাতা কেন সারা ভারতবাসীর কেউ বোমা পড়লে কি অবস্থা হয় জানত না। দেখতে দেখতে কলকাতা অর্ধেক খালি হয়ে গেল। আমরাও, এক পিতৃদেব বাদে সবাই আত্মীয়স্বজন সহ আলকায় আমাদের বাড়ীতে চলে গেলাম। তিন চারমাস কলকাতা প্রায় lockdown ছিল। হাতিবাগান না কোথাও incendiary বোমা পড়েছিল। শুনেছিলাম। কিন্তু তার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা বেশী ছিল না। মাস ছয়েকের মধ্যে আবার কলকাতা ছেড়ে যাওয়া জনসংখ্যা ফিরে এলো। আমার দিদিরা তখন college এ পড়তেন। তাঁদের তো ফিরতেই হল। কিন্তু আমার বেলায় আমার অভিভাবকরা ঠিক করলেন আমি গড়পাড় রোডের Athenium Institute থেকে Class VII যখন পাশ করেছি, গ্রামের school 'Phultala High School' এ Class VIII এ ভর্তি হয়ে যেতে পারব। School এর Head Master ও রাজী হয়ে গেলেন – কলকাতা থেকে আসা একটা student পাওয়া school এর গর্ব ছিল। এখন আর বলতে সংকোচ নেই school এর ছেলেরা শুধু নয়, মাস্টার মশাইরাও আমাকে একটু বিশেষ চোখে দেখতেন। Class VIII, IX, X এবং Matriculation Phultala High School থেকে পড়ে First Div. পেয়ে পাশ করে কলকাতার college এ I.Sc. পড়তে আসি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তিন বছর টানা আলকা গ্রামের বাড়ীতে থাকলেও ভুণ্ডুলদার সাহচর্য্য পেলাম না। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে – Railway তেও Dept. ভাঙ্গাগড়া চলছে। হয়ত আর্থিক কারণেই সংসারে cash টাকার প্রয়োজন হওয়াতে আমার পিতৃদেব (ভুণ্ডুলদার নগেনদাদু) ভুণ্ডুলদাকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন এবং Rly. তে একটা চাকরীতে বসিয়ে দিলেন। মাসে একবার কি দুবার ভুণ্ডুলদা গ্রামে আসতেন মায়ের হাতে সংসার খরচের টাকা তুলে দিতে। কলকাতায় একটা থাকার জায়গা করে দিয়েছিলেন – সকাল, রাতের খাবার আমাদের বাসায় হত। আমি যখন তিনবছর গ্রামের school থেকে পড়াশুনা করে কলকাতায় এলাম আর ভুণ্ডুলদাকে পেলাম না। ভুণ্ডুলদা তখন Bombay তে আমার বড় জ্যাঠামশাইয়ের সেজ ছেলে, আমরা সেজদা বলতাম, তাঁর একটা Electrical shop এর দেখাশোনা করতে Bombay পাড়ি দিয়েছেন। Bombay পাড়ি দেওয়ার ঘটনাও একটা ইতিহাস। লিখলাম না। ভুণ্ডুল যে একজন করিতকর্মা ছেলে সেটা আমিও জানতে পেরেছিলাম। গ্রামের

কোন বাড়ীতে সমস্যা দেখা দিলে, যেমন অসুখ করলে ডাক্তার ডেকে আনা, ওষুধপত্রের যোগাড় করা ইত্যাদি কোন কাজের লোক না থাকলে সবাই একবাক্যে বলতেন ভুণ্ডুলকে খবর দাও। তাঁর চরিত্রে মানুষের উপকার করার প্রবৃত্তি যে ছিল, এর থেকে বোঝা যায়। তবে অন্তরের আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ কবে হয়েছিল আমি জানিনা। হয়ত Bombay থেকে Pondicherry-তে চলে যাবার কারণই হয়ত এই উন্মেষের ফল। আমি ১৯৫১ সালে Shibpur B.E. College থেকে বেরিয়ে প্রথমে W.B. Irrigation Dept. DVC, Indian Oil কর্মসূত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিদেশেও ঘুরে বেড়াতে হয়েছে – তাই সাধক শ্রীপ্রীতিকুমারের সান্নিধ্য আমার পাবার সৌভাগ্য হয়নি। শুধু একদিন সুভাষ বলে আলকা গ্রামের বোসপাড়ার ছেলে, আমার school এর class mate আমাকে তোমাদের শ্যামবাজারের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দেখা করিয়েছিল – তখন ভক্তবৃন্দ দিয়ে ঘিরে ছিলেন, দূর থেকেই নমস্কার করতে পেরেছিলাম – এ খবরটা তোমাদের আগেই জানিয়েছি। ভুণ্ডুলদার ছোটবেলাকার বিশেষ ঘটনা জানাতে পারলাম না। তবে একটা ঘটনার কথা (শোনা) লিখে এই লেখা শেষ করছি।

আমার এক বড়দা ছিলেন, রেলে চাকরী করতেন। একদিন আমাদের কলকাতার বাসায় বাবাকে এসে বললেন, "আমি দিল্লী থেকে ফিরছিলাম। গয়া station এ গাড়ী থামলে জানালা দিয়ে দেখলাম একদল লোক তাঁদের গুরুদেবকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছে। গাড়ী থামলে ভিড়ের মধ্য থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি আর কেউ নন – আমাদের ভুণ্ডুল। ভক্তরা জয়ধ্বনি দিতে দিতে একটা reserved কামরার দিকে নিয়ে গেল। চোখ কচলে আবার দেখলাম কোন ভুল নেই আমাদের ভুণ্ডুলই।"

নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল – ঘোষ দাদা

পুনঃ- বয়েস হয়েছে, লিখতে গেলে হাত কেঁপে যায়, বানান ভুল হয়ে যায়। Proper Expression-এর ভাষা খুঁজে পাই না। এইসব ত্রুটিগুলি মেনে নিও। ..... অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা লেখা হয়ে গেল। ক্ষমা করবে তোমাদের সময় নষ্ট করার জন্য।

খিদে

সুনন্দন ঘোষ

যদি খিদে না থাকতো?
ময়দানে মাদারির খেলা কি দেখাতে হত
সাত বছরের মেয়েটাকে
শূন্যে দোল খাওয়া দড়ির উপর পা টিপে টিপে হেঁটে?
ঠা ঠা রোদে রঙ মেখে সেন্ট্রাল এভেন্যুতে
মেয়েগুলোকে কি পণ্য হবার জন্য অপেক্ষা করতে হত?
ট্রেনের চাকায় পা খোয়ানো হকারকে
ভিক্ষে করতে হত ভিড়ে ঠাসা ট্রেন কামরায়?

খিদে আছে!
আর আছে খিদে মেটানোর ছলনা।
তাই তো জঙ্গল মহলে
রেশন ডিলার সাত মহলা প্রাসাদ বানাতে পারে,
গ্যাসের ডিলার বি এম ডব্লিউ চাপে,
আমলা-উর্দির অশুভ বন্ধনে শ্যামল বনানী হয়ে ওঠে
মৃত্যুর চালচিত্র।

একটা দুটো করে নীরক্ত শরীর জোট বাঁধে।
আগুন চারায় শরীর থেকে মনে,
পেটের আগুনে সংসার ঝলসায় ---
মনের আগুনে পুড়তে থাকে দেশ ---

ইতিহাস বইয়ের লেখককে কিনে নেয় শাসকেরা।
ইতিহাসকে কেনা যায় না।

অভুক্ত যোদ্ধারা আগুনের অক্ষরে লেখে নতুন যুগের ইতিহাস।

DO NOT COPY